OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 519 - 527
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সে’ : রূপকথা হয়েও রূপকথা নয়

অর্চিতা ভৌমিক
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: archita.bhowmik2013@gmail.com
0009-0002-1391-885X

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Fairy tale, Rabindranath Tagore, Shey, Child, Pupe, Sukumar, Folk tale, story.

Abstract
Rabindranath Tagore’s ‘Shey’ - has no name, only a pronoun. Wrapped in this ‘Shey’, Rabindranath Tagore actually consciously broke apart the fairy tale to give birth to a new fairy tale. Not a king, not a prince - the story is built with a blend of imagination using the real people we know from our everyday reality. Here, Sukumar could not cross the fields of Tepantar to go and rescue the princess. The eternal happy ending of fairy tales does not happen here - like princes in real life, he had to surrender his life to fate and wait. From this contrast itself the question arose - whether Rabindranath Tagore’s ‘Shey’ is actually a fairy tale at all! In the discussion of the main article, it has been explored how 'Shey' evolved to take the form of a different kind of fairy tale. Even though it remains a fairy tale in mood and in its core tune, its structure and form have completely changed. As a result, ‘Shey’ is both a fairy tale, and also not a fairy tale - an evolved fairy tale.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সে’ - একটা যাত্রা যেন, এক গল্প অন্য গল্পে ঢুকে পড়ছে শ্রোতার দাবী মতো। গল্পের সঙ্গে যাপন যেন গল্পকথকের, নয় বছরের শ্রোতা নাতনী পুপের, আর ‘সে’-র। এখন প্রশ্ন হল ‘সে’ কে? উত্তরে বলা যায়, গল্পকথকের রূপকথার ‘এক যে আছে মানুষ’[১], যার নাম কাউকে বলা বারণ। জানে শুধু কথক আর শ্রোতা। কথক বলেন –

> “বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ করে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ; কেউ বলে পিটার্স, কেউ বলে প্রেস্কট, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।”[২]

অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকে বা আমাদের পছন্দমত যে কেউই হতে পারে ‘সে’। এখন যদি এই প্রশ্ন মনে আসে যে এই উদ্ভট, আজগুবি গল্প লেখার কারণ? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "নাতনির ফরমাশে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্য-মিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন'বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হালকা ওজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ।"[৩]

অর্থাৎ দায়ভারহীন, মাথা-মুণ্ডহীন এমন কিছু এনে হাজির করলেন পাঠকের সামনে। তার ওপর আজগুবি চরিত্রের ছড়াছড়ি। সঙ্গে শ্রোতার আসনে এক শিশু— রূপকথার মূল উপাদান। 'শিশু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যে বাড়ছে', প্রাচীন 'শূ' ধাতু থেকে শব্দটি এসেছে, যার অর্থ 'বেড়ে ওঠা'।[৪] অর্থাৎ এক সংবেদনশীল মন, বিস্ময় ও বিশ্বাসের অপার জগৎ। আর আছে অনন্ত কৌতূহল, যা ফুরোয় না। ফলে রূপকথার গল্প চলে আবহমান কাল ধরে। এখানে পুপে ধারণ করে থাকে সেই চলমানতা। ফুরোতে দেয় না। বলে, 'না, সে হবে না কিছুতেই। তারপরে কী হল বলো।'[৫] ফলে গল্প শেষ হয়ে গেলেও জোড়াতাড়া দিয়ে আবার শুরু হয়। ছিয়াত্তর বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পুপেদিদিকে হাসানো সহজ হয় না। কখনো দায়িত্ব নেয় 'সে', কখনো গল্পকথক। গল্পকথকের বুদ্ধির চাতুর্যে হাস্যরস হারিয়ে যায়। 'সে' বলে, —

> "বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। ...লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল দেখতে পাওনি বুঝি? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে- বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।"[৬]

এভাবেই কখনো বুদ্ধির চাতুর্য, কখনো আজগুবি গল্পের মিশেলে এগিয়ে চলে 'সে'-র গল্পমালা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সে'-র গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একথাই বলেছিলেন যে, -

> "এই বইতে বড়োদের দৃষ্টি দিয়ে ছোটদের মনের রহস্য বোঝবার চেষ্টা।"[৭]

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়েছে 'সে'। তারই কয়েকমাস আগে মাঘ, ১৩৪৩-এ প্রকাশিত হয়েছে 'খাপছাড়া'। এই পদ্যের সংকলন লক্ষ্য করলে যেন দেখা যায় শুধু গদ্য ও পদ্যে পার্থক্য, উদ্দেশ্য এক। 'সে'-র উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে- মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেন উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই-
কোনো দায় নাই।"[৮]

রেভারেন্ড লালবিহারী দে 'Folk Tales of Bengal' (১৮৮৩ খ্রি.) কিংবা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকু'মার ঝুলি' গ্রন্থে (১৯০৬ খ্রি.) প্রাচীনকালের যে গল্পগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন সেগুলি লোকায়ত জগতের আবহমানকালের সুর ধ্বনিত করে। এই রূপকথাগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আজীবন আকর্ষণ করেছে। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'লিপিকা'-র গল্পগুলি তার প্রমাণ। 'ঠাকু'মার ঝুলি'-র ভূমিকা লিখতে গিয়ে সে কারণে বলেছিলেন, -

> "ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এত বড়ো স্বদেশি জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?"[৯]

ফলে গল্পকথকের স্বদেশী এই সাহিত্য রূপকথার প্রতি টান নতুন নয়। জীবনের শেষের দিকের সৃষ্টি এই 'সে'-তেও এল রূপকথার আদল। কোথাও কোনো নাম নেই, কোন দায় নেই, শুরু-শেষের ভাবনা নেই। কিন্তু ওই গঠন আর কিছু উপাদানই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কেবল রূপকথার। আদলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আস্ত একটা সময়। সহজ সরল শিশুর প্রশ্নে প্রশ্নে উঠে আসছে রূপকথার ভিতরে এক অন্য রূপকথা। পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগে 'সে' আসলে রূপকথা, না রূপক?

'সে'-র কিছু লেখা 'সন্দেশ', 'রং মশাল', 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটোদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলেই গল্পকথকের বুদ্ধির চাতুর্যটা বদলে সমাজের আয়নাটা মুখের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। ন'বছরের শিশুর শ্রোতা রূপে গল্প শোনার আগ্রহটা উঠে আসায় ধরা পড়লো না যে বার্ধক্যের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বয়ঃসন্ধিকালের শিশুর মনস্তত্ত্বের বিবর্তনটা দেখে নিতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ। আজগুবি প্রসঙ্গের অবতারণা আরো বেশি রূপকথা জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু একটু সচেতন পাঠই ধরে ফেলে ভাঙ্গা-চোরার ও নতুন করে রূপকথাকে রূপদান করার কৌশলটি। ফেলে আসা পাঠকেরা 'সে'-র পাঠকের কাছে যেন জানতে পারে বর্তমান সময় শুভ বা মঙ্গলময় পরিণতির নয়, এখন আর আমার কথাটি ফুরায় না, নটে গাছটি মুড়োয় না ঠিক তথাকথিত রূপকথার মতো। এখানেই বিবর্তনের শুরু।

কখনো 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধের পাতায়, কখনো 'লিপিকা'-র গল্পে বার বার উঠে এসেছে 'সে'-র গল্পবীজ। 'রাজপুত্তুর' গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, -

> "যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায় - সেই ঘর ছাড়া মানুষ তেপান্তরের মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।"[১০]

ঠিক এইখান থেকেই 'গল্প বলো'-র সূত্র ধরেই 'সে'-র সূচনা। বিধাতা যেমন মানুষ তৈরি করেছে রক্ত মাংসের, ছোটোশিশুর দাবী মতো 'সে'-তে মানুষ তৈরি হয়েছে তেমনই ভাষায়। ঠিক যেমনটা রূপকথায় তৈরি হয়। বাস্তব-অবাস্তবের দোআঁশলা মিশেল দিয়ে গড়ে ওঠে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সুয়োরানী দুয়োরানী, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী আরো কত কী! রূপকথার মাধ্যমেই শিশু সংসারকে প্রথম চেনে। রূপকথা তাকে ঠকায় না। বরং বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষই জ্ঞানের অভিমানে রূপকথাকে হারিয়ে ফেলে। 'কথা' শব্দটি 'কথয়তি' এই ক্রিয়া থেকে আসেনি, এসেছে 'কথা' শব্দ থেকেই। সর্বনামজাত অব্যয় এটি। অর্থ 'কেমন করে'। বাংলায় লৌকিক কাহিনি অর্থাৎ folk tale বা fairy tale অর্থে একসময় 'অপূর্বকথা' শব্দটি চলিত ছিল। কালক্রমে তা 'অপুরূব কথা' থেকে 'অপরূপ কথা' হয়ে অবশেষে 'অপ' বাদ দিয়ে 'রূপকথা'। মোটামুটি ভাবে মানুষের সামাজিক মানসিকতা এবং ব্যক্তিমনের বহু সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রতিফলন এই রূপকথা। রূপকথায় গল্পগুলি খুব সাধারণভাবে শুরু হয় ও শেষ হয়। জটিল বিন্যাস থাকে না, আকস্মিকতা ও পুনরাবৃত্তি থাকে না। ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষের স্পষ্ট বিভেদ থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহানুভূতি পায় রাখাল ছেলে বা কাঠকুড়ুনি অর্থাৎ গরীব ঘরের সাধারণ মানুষ। দুর্বলতম চরিত্রও শেষ অবধি প্রতিস্পর্ধী চরিত্রের বিরুদ্ধে জিতে যায়। শুভ শক্তি জয়লাভ করে জাদু শক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সহায়তায়। রূপকথায় একধরনের কিছু মোটিফ থাকে আর অবিশ্বাস্য ঘটনাবলীতে রূপকথা পূর্ণ থাকে। আর থাকে 'উইশফুল থিংকিং' বা মানস অভিব্যঞ্জনা। পরিণত মানুষের চেতন-অবচেতনের অজস্র অভিঘাতে ছেলেভুলানো গল্প রূপকথা নয়। ঠিক এই অনুভবের স্থান থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সে'-র গল্প কাঠামোকে, ব্যঞ্জনাকে ধরতে চেষ্টা করা যায়।

মাথা নেই, মুন্ডু নেই, একটার পর একটা গল্প জুড়ে দেওয়া, গল্পকথকের ভাষায়, -

> "এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে কষে বাধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা করে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা নয়।"[১১]

এখানে লুকিয়ে রূপকথার আদল। বাস্তবে যা অসম্ভব, বিধাতার কলকাঠিতে কষে বাঁধা, রূপকথায় তার সব ঘটিয়ে ফেলা যায়। স্থান কালের বিধি নিষেধ নেই। 'সে'-তেও নেই। যা কিছু স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ তাই উঠে এসেছে। মানব মনের অবচেতন স্তর, স্বপ্ন সবই রূপকথার মতো 'সে'-তেও এল। পুপে চারপাশে দেখা চাপাপড়া ইচ্ছেগুলো নিয়ে 'কাবুলি বিড়াল' হতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চাইল। রূপকথার মতই নানান অসম্ভব ঘটনা ভিড় করে এসেছে বারবার - হুঁ হাউ দ্বীপের মানুষের পাকযন্ত্র বাদ দেওয়া, 'সে'-র খোলস ত্যাগ, শেয়ালের মানুষ হতে চাওয়া, আমসত্ত্ব দিয়ে উচ্ছেসেদ্ধ রান্না, ভোর সাড়ে চারটেতে নতুন বর-বউের মানকচু কিনতে যাওয়া, স্মৃতিরত্ন মশাই-এর মনুমেন্ট চেটে ফেলা, বাঘের গ্লিসেরিন সোপ চাওয়া, তারকেশ্বরের প্রসাদ দু'কৌটো লাহিড়ী কোম্পানির মুনলাইট স্নো, পুপেদিদিকে খরগোশে চুরি করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। রূপকথার নানান চরিত্রও 'সে'-তে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয় - ব্যঙ্গমা, রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়া, শুক-সারি পাখি, পশুকথার মতো কথা বলা বাঘ, শেয়াল ইত্যাদি। তবে রূপকথায় বাস্তবের উপাদানকে বহন করেই রূপকথার চরিত্র সৃষ্টি হয়। এখানে রূপকথা থেকেই চরিত্র নেওয়া হচ্ছে সম্ভব-অসম্ভবের গল্প বলার জন্য। সুকুমারের উপর যেমন রাজপুত্রের কাঠামোটাকে আরোপ করা হচ্ছে। গল্পশেষে সুকুমারকে নায়ক বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে জিতে যাচ্ছে না। ঠিক এইখান থেকেই 'সে'-র গল্প ঘুরে যাচ্ছে। রূপকথা হয়েও ঠিক রূপকথা হচ্ছে না। রূপকথার কাঠামো ভাঙছে।

'লিপিকা'র 'গল্প' নামক গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

> "ছেলেটির যেমনি কথা ফুটলো অমনি সে বললে, 'গল্প বলো'।
> দিদিমা বলতে শুরু করলেন, 'এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর-'
> গুরুমশায় হেঁকে বললেন, 'তিন-চারে বারো'।"[১২]

তিন চারে বারো হল সত্যি আর রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুরেরা হল মিথ্যে। ছেলেটির মন মানসচিত্রের সমুদ্র পেরোলেও মানচিত্রে এসে বাধা পায়। ফলে তিন চারে বারোর ধারাপাতে গন্ডগোল হলে বেতের সাহায্যে শোধন করতে হয়। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'সে'-র সৃষ্টি। বাধা নেই, নিষেধ নেই, ইচ্ছে মতো গল্প বানাও। সার্কাস দেখে এসে পুপে বাঘের সাথে কথা বলে, বাঘ এটা চায় ওটা চায়। গল্পকথকের বুদ্ধিদীপ্ত গল্প পছন্দ না হলে 'সে' গল্প বলে। 'সে' গল্পকথকের গল্পে মরে গেলেও পুপে প্রায় সাবিত্রী হয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। ঠিক এভাবেই রূপকথারও চেনা ছক ভেঙে ফেলছেন রবীন্দ্রনাথ। যা আদতে শিশুসাহিত্য নয়, তাকে শিশুসাহিত্যের কোঠায় ঠেলে না দিয়ে ছক ভাঙ্গার খেলায় মাতলেন তিনি।

রূপকথার গল্প বেশিরভাগই শুরু হয় এক যে ছিল রাজা দিয়ে। এখানে শুরু, 'এক যে আছে মানুষ' দিয়ে। যার খিদে পায়। মুড়োর ঘন্ট, লাউচিংড়ি, কাটাচচ্চড়ি, বড় বাজারের মালাই, এমন কী আইসক্রিম দিয়েই যাকে খুশি করা যায়। বাস্তবের মজুমদারের জামাইবাবুর সঙ্গে যার মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষটি খুব সাধারণ। প্রিয়নাথ বা পঞ্চানন বা পাঁচকড়ি কেউ একটা। যে যার মতো করে ভেবে নিতে পারে। রূপকথার চরিত্রদের খিদে পায় না, সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কেউ, স্বপ্নের কেউ। কিন্তু 'সে' ক্ষুধার্ত। একেবারে বাঙালি খাবারেই 'সে' খুশি। একেবারে ঘরোয়া কেউ। 'সে' মাত্র একটি সর্বনাম, আমি-তুমি বাদে যে কেউ। তাকে নিয়ে যা কিছুই করা সম্ভব। গল্পকথক বলেছেন—

> "আমার আজগবি গল্পের এত বড় উত্তরসাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে।"[১৩]

একই সঙ্গে গল্পকথকের দুই রূপ ও শ্রোতা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়া - এ তো রূপকথার ধরন নয়। এখানেও ছক ভাঙছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ চোখে দেখা যায় এমন কোন মানুষ 'সে'। 'সে' গল্পে ঢুকে পড়ছে ছবির মত অনেকটা। ঝমঝম বৃষ্টিতে বসে বাটিতে রং গুলে রবীন্দ্রনাথ যা আঁকার চেষ্টা করছিলেন অনেকক্ষণ ধরে, তা যেন রূপ পেল।

> "সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপটে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিন্ডি।"[১৪]

এরকম অতর্কিতে চরিত্রের প্রবেশ রূপকথার বৈশিষ্ট্য নয়। রূপকথার আঙ্গিক ভেঙে গেল। প্রবেশ করেই হাঙ্গামা বাধিয়ে দেওয়া রূপকথার চরিত্রদের বৈশিষ্ট্য নয়। 'সে' তাও দিল। লক্ষ্মৌ ছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে মাথা মুছে গায়ে জড়িয়ে বসলো। আবার বিচ্ছিরি গলায় গানও ধরলো। রূপকথার চরিত্ররা গান করে না। রূপকথায় যা থাকে, তাও লৌকিক ছড়া- এখানে একেবারে হিন্দুস্থানী গানের প্রসঙ্গও এলো। কোন্নগর, উত্তরপাড়া, লক্ষ্মৌ-কাশ্মীর বিভিন্ন জায়গার নাম এলো। রূপকথায় পাতালপুরী-যক্ষপুরী এসব থাকলেও স্থান-নামের নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা কখনোই থাকে না। এখানে বাস্তবের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার নাম উঠে এলো। মিথ, লোককথা, কিংবদন্তি, ম্যাজিকের জায়গায় এলো কল্পবিজ্ঞান। হুঁহাউ দ্বীপের বৈজ্ঞানিকরা পাকযন্ত্রটাকে উপড়ে দিয়ে কেবলমাত্র নস্য নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, কিংবা চতুষ্পদ হওয়ার চেষ্টা করছে, 'সে'-র গুলি লাগা মগজের মধ্যে হনুমানের মগজ ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে অতি উৎসাহী বিজ্ঞানী। লোহার তার সোনার তার যেন জড়িয়ে যাচ্ছে।

রূপকথার রাজপুত্র এলো, কিন্তু তাকে রাজপুত্র রূপে কল্পনা করছেন রবীন্দ্রনাথ। যেন পুপে দিদিকে ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে উদ্ধার করে আনবে। কিন্তু সুকুমারের 'ছত্রপতি' উড়তে অসমর্থ। পক্ষীরাজ ঘোড়ার পরিবর্তে উড়োজাহাজের চাকরি সুকুমারের ঠিকানা হয়। বাস্তবের আঘাত রাজকন্যার চোখে জল আনে। এখানে রূপকথাকে ভাঙা হচ্ছে শুভ পরিণতির দিক থেকেও। বাস্তবের রূপকথায় শেষ সবসময় সুখকর, মঙ্গলময় হয় না। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সুকুমারেরা বেঁচে থাকে না, তাদের জন্য সোনার কাঠি হাতে কেবল যম নামক দয়াময় দেবতাটিই বেঁচে থাকেন, আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কেবল তাদেরই খবরদারি ও সর্দারি যারা 'টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে।"[১৫]

রূপকথায় স্বর্গের ছবি থাকে - যেখানে সবটাই রঙীন। রবীন্দ্রনাথ যে স্বর্গের কথা জানালেন তা গঙ্গাপাড়ের কোনো কারখানার। দেবতা সেই কারখানার কর্মচারী। বাইকের পান্ডা আসলে জুলুম করা মস্তান। এ আসলে আমাদের চারপাশের স্বর্গের, প্রকৃত রূপকথার ছবি।

রূপকথা যেহেতু মৌখিক সাহিত্য, শব্দ ব্যবহার এখানে গুরুত্বপূর্ণ। রূপকথায় লৌকিক শব্দ ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের 'সে'-তে এখানেও বিবর্তন। ঢুকে পড়ছে সমসময় উপযোগী নানান ইংরেজি শব্দ। মুখের কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করার দরকার, নয়তো পুপে শুনবে কেন! চরিত্ররা খায়-দায়, ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখার শখ আছে। আহারের ফর্দ হয় ভিটামিনে ঠাসা। বোলপুর স্টেশন, ফাউন্টেন পেন, মুনলাইট কোম্পানির স্নো, বাইক, বুক পকেটে ফাউন্টেন পেন, চায়না-কোট, টাইমটেবিল, ট্রাম - অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চলতি সময়ের শব্দভাণ্ডার ব্যবহৃত হয়েছে গল্পগ্রন্থ জুড়ে। উদাহরণ খুঁজলে মিল-অমিলের তালিকা এমন বিস্তর হবে। কিন্তু রূপকথার সঙ্গে মিল ও অমিলের টানাটানিতে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না মূল রূপকথার সুরকে ধারণ করেও রবীন্দ্রনাথের 'সে' - রূপকথা থেকে রূপকের পথে যাত্রী।

রূপকথা অলীক, রূপকথা অবাস্তব - এইসব সরিয়ে ফেলে রূপকথায় যখন বঙ্গদেশের নিখুঁত পরিবারের সম্পূর্ণ সামাজিক ছবি, জয়-পরাজয় মিলিয়ে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের খোঁজ পাওয়া গেল; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকেও ভেঙ্গে দিলেন। সামগ্রিকতার বদলে টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি আনলেন, নাম-ধামহীন রূপকথায় বাস্তব মানুষ আনলেন, কথক-শ্রোতা নিজেই নির্দিষ্ট করে দিলেন, আর বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস দিলেন উজাড় করে। তবে হাস্যরস দিয়ে শেষ হল না। শিশুরা যেমন রূপকথার হাত ধরে বাস্তব থেকে অবাস্তবে, মূর্ত থেকে বিমূর্তে পাড়ি দেয়; গল্পকথক সুকুমারের হাত ধরে অবাস্তব থেকে বাস্তবে যাত্রা করালেন। সুকুমার গাছ হতে চেয়েছিল, প্রথম মেঘ করা আষাঢ়ের বৃষ্টি ভেজা আকাশ কিংবা পুজোর ছুটিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পানসি নৌকাও হতে চেয়েছিল; অন্তত একটা ছবি আঁকতে চেয়েছিল; কিন্তু সুকুমারের বাবা তা চায়নি। ফলে উড়োজাহাজের মাঝিগিরি করতে দূর দেশে যেতে হয়। কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানানো সম্ভব হবে কিনা সুকুমার জানে না, মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। সত্যযুগে ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল, বর্তমানে নয়। সে কারণেই রাজপুত্রের পরিচয় এরপর একেবারে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া হল - রূপকথা এরপর আর গল্পচ্ছলে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। যেন শ্রোতাকে জানিয়ে দেওয়া হল অমলকান্তিরা কোনোদিন রোদ্দুর হতে পারে না। এটাই বাস্তব। সুকুমারের মধ্যে গল্পকথক নিজেকেই হাজির করেছিলেন কতকটা—

> "ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে।"[১৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখন বলা যায়, গল্পকথক আছে, শ্রোতা আছে, তবে এখানে 'সে'-কে কেন আনা হল? গল্প শুরু করে দিয়ে কিছুটা পর থেকে 'সে' অনুপস্থিত। তবে 'সে' কি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র? আসলে মূর্তি তৈরি করতে যেমন কাঠ-খড়ের একটা কাঠামো প্রয়োজন হয় 'সে' যেন সেই কাঠামো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই আরও একটা মুখ। যতবার এসে পড়েছে বয়সের ভার, শিশুকে বলা গল্পেও অতিরিক্ত বাস্তব সমাজ, গল্প ভারী হয়ে যাচ্ছে বুদ্ধির প্রাচুর্যে; ততবার সচেতন করেছে 'সে' —

> "বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে না পার তাহলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।"[১৭]

পুপে বড় হয়ে গেলে কথোপকথনের জন্য 'সে'-কে আর প্রয়োজন হচ্ছে না, সে কারণেই 'সে' অনুপস্থিত। আসলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির প্রতি 'সে' প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যে কারণে 'সে'-র গান বেসুরো, 'সে' রবীন্দ্রনাথেরই নকল করে প্রায় বাঘের কবিতা লেখে, জগতের সমস্ত বিশৃঙ্খলার প্রতি অতি উৎসাহ দেখায়। কল্লোল গোষ্ঠীর সে সময়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতার কথা মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-ঠাট্টার আশ্রয়ে নিজেকে ওলট-পালট করে দেখেছেন আবার রবীন্দ্র বিরোধী কবি গোষ্ঠীর ভুল ভেঙে দিয়েছেন। 'প্রগতি' পত্রিকা (১৯২৭ খ্রি.) সে সময় প্রবলভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেছে। কিছুদিন আগেই 'শেষের কবিতা' লিখে রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিয়েছেন। আর কিছুদিন পরেই লিখেছেন 'সভ্যতার সংকট'। এই দুই-এর মাঝে শিশু পাঠ্য নামক এই বই 'সে' কিংবা একইসঙ্গে লেখা 'খাপছাড়া', 'গল্পস্বল্প' আদৌ কি শিশু পাঠ্য? — এই প্রশ্ন ওঠে। শিশুদের নিছক নিঃসাড়, যুক্তিবুদ্ধিহীন ভেবে কি এ লেখা লিখেছেন? তাহলে অন্তরঙ্গ, মন খোলা, গভীর আলাপ হতে যাবে কেন? একই সময়ে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখায় ভিন্নতা আসা সম্ভব নয়, সময়ের ছাপ পড়বেই। সে সময় তিনি ছিলেন প্রচণ্ডভাবে অস্থির। অসহিষ্ণুতার তীব্রতা, নিজের মধ্যেকার এবং সময়ের সংকট এড়াতে পারেননি 'সে'-র গল্পমালায়— শিশু এসেছে তার অফুরান খোলামেলা উৎসারের বাহন হয়ে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন এগুলি না - লিখে কোন উপায় ছিল না। এই ভাবেই নিষ্কাশিত করতে হয়েছিলো সব তাপ, নিরর্গল ক'রে দিতে হয়েছিল সব কপাট- বাধ্যতা ছিল ভিতরকার, ছিল ক্ষমাহীন দাবি।"[১৮]

'সে'-র প্রচ্ছদপট বারবার বদলেছে পুরোনো সংস্করণে 'সে'-র ছবি এরোপ্লেনের ছুঁচলো মাথার মতো আকাশগামী, তার নীচেই চোখ, পরপর কতগুলি থাক সামনের দিকে ছুঁচলো; ঠোঁট, দাঁত, চিবুক মিলিয়ে এক কিম্ভুত চিত্ররূপ। বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে এর পরিবর্তে এসেছে এক মাংসল হাসি-কান্নায় ভরা মুখ। রঙ-রেখার সূক্ষ্মতা, কৌতুকের মিশেল নেই, বরং করুণা আছে সে মুখে। এখন প্রশ্ন আসে তবে কোনটা 'সে'? প্রথম না দ্বিতীয়? নাকি উভয়ই? 'সে' তবে বহুরূপী। সমর্থন না করে উপায় থাকে না কারণ গল্পগ্রন্থ জুড়ে 'সে' বহুবার রূপ পরিবর্তন করেছে। এমনকী খোলস ত্যাগ করে অন্যের শরীর ধারণ করে দেখেছে, মগজে ঢুকেছে হনুমানের মগজ। ফলে শরীর বদল, মগজ বদল - এসবই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচেতন সৃষ্টি বোঝা যায়। 'সে'-র মধ্যে দিয়ে আসলে নিজেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন। ছবিও এঁকেছেন স্পষ্ট-অস্পষ্টের সীমারেখা তুলে দিয়ে। কোনটা-কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝে নিতে হয়।

'সে' ছাড়াও এসেছে বাঘ চরিত্রটি। বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। গোটা লোকসাহিত্য জুড়ে বাঘ হয় খল, নয় বোকা, নয় হিংস্র। তাকে শায়েস্তা করতে পারলেই জয় সূচিত হয়। যেমন পুপেকে 'বীরাঙ্গনা' প্রমাণ করতেই বাঘকে আনা হয়েছে কয়েকবার—

> "তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে নুটু পিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল।"[১৯]

আবার সার্কাস দেখে আসার পর পুপের মনকে 'বাঘের বাসা' বলা হয়েছে। এখানে অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গ এলো বাঘের সূত্রে। ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সে' কবিতা লিখেছে বলে বাঘকে নিয়ে কবিতা শোনালেন—

"ছুঁস নে ছুঁস নে, বলে বাঘ,
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাঘনাপাড়ায় বদনাম
রটে যাবে; ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা।"[২০]

এরপরই বাঘকে রূপ দিলেন ঝোপে থাকা ভয়ংকরতায়। বাঘ যেন 'প্রখর নখর বিভীষিকা', 'জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস/ হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।'[২১] এ তৎসম শব্দবহুল কবিতায় পুপের কাছে স্পষ্ট না হলেও সমাজে ত্রাস সৃষ্টিকারী বাঘেরা আছে। এ সময় সমাজে প্রগতি চিন্তার প্রসার ঘটে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো কলকাতায় প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনার আগুনে প্রগতি প্রচেষ্টা একসময় হাস্যকর হয়ে ওঠে যুক্তিহীন আবেগে। কথক বলেন—

> "ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ সমাজে বলে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য বলে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব; বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব; হালুম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব— এমন - কি বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব। এত ঔদার্য।"[২২]

একইভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে বুদ্ধিদীপ্তভাবে, 'রিপোর্ট' অধ্যায়ে। এখানে শিবা শোধন সমিতিতে শেয়ালের মানুষ হতে আসার মধ্যে উন্নতিকামী দেশবাসীর ভারত উদ্ধারের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ফুটে উঠেছে। পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাওয়ার জন্য পাতুর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করে। মিথ্যে সাক্ষী এনে উকিল-মোক্তার-হাকিম অন্যায়ের সঙ্গ দেয়। এ তো জলজ্যান্ত সমাজ-প্রতিচ্ছবি। কল্পবিজ্ঞানকে তুলে এনে কথক দেখিয়েছেন গবেষণার উদগ্র নেশা বিজ্ঞানকে কীভাবে ভুল পথে চালিত করে। একটি মানুষের অসহায় মৃত্যুতেও বৈজ্ঞানিক খুশিতে লাফ দিয়ে ওঠে। তারপর বেমানান বিজ্ঞানের ফসলকে গোটা সমাজের কেউই মেনে নেয় না, বিয়ের বাজারেও দাম কমে যায়।

> "জু'-র কর্তা বললে, এখানে মানুষ পোষা আমাদের বরাদ্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাঁদরপোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।"[২৩]

তারপর 'সে'-র গা নিয়ে যে হাঙ্গামাটা বাঁধালেন গল্পকথক, তাতে তো বুদ্ধিদীপ্ত চরম বাস্তব রয়েছে। গা বদল করে দেখিয়েছেন অন্যের গা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কত হাঙ্গামার। যুক্তিশৃঙ্খলা নীতিবোধ নিয়ে চললে রবীন্দ্রনাথ সমাজবাস্তবতার এই জলজ্যান্ত রূপ তুলে আনতে পারতেন না। 'কারিগরি' ঢুকিয়ে তবেই বলে গেছেন অদ্ভুত কথা। কথকের কথা মতো, ননসেন্স লেখার মধ্যেও কোথাও কোথাও সেন্স থাকতেই হবে। অসম্ভাবনার তাৎপর্যটি যদি উদ্দেশ্যময় না হয় তবে আক্ষরিক অর্থে ননসেন্স হওয়ার সম্ভাবনা। 'সে'-র মধ্যে এই কথাটি নানানভাবে বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' লিখছেন ১৯৩৭ সালে। সে কারণেই বিজ্ঞান মনস্কতা বার বার ছড়িয়ে পড়েছে কাহিনির ভিতরে, বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে। বারো নম্বর কাহিনিতে আলোর কণিকা, আলোর প্রবাহ, রেডিয়াম, ইলেকট্রন এসবের প্রসঙ্গ আসছে। জগৎটা যে শিশুর চোখে আরও বিস্ময়কর বস্তু হয়ে উঠছে তাই-ই খেলার ছলে বলে চলেছেন। শব্দ, ভাব, গদ্যকাব্য, গান সবেতে পরিবর্তন আসছে। নাতনি দাদামশায়ের গদ্যকাব্য সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করলে দাদামশাই নির্দ্বিধায় লোহার ও সোনার ইলেকট্রন মিলেমিশে যাওয়ার কথা বলেন। বিজ্ঞানের যুগকে, যন্ত্রের যুগকে রবীন্দ্রনাথ কখনো অস্বীকার করেন নি। শুধু শুভ পথে চালিত হওয়ার কথাই বারবার বলেছেন। যন্ত্র মানুষকে ছাপিয়ে উঠলে 'মুক্তধারা'-র অভিজিতের পরিণতি হবে মানুষের। এই আশঙ্কাই বারবার থেকে গেছে লেখনীর তলায় তলায়।

এই গল্পে উল্লেখযোগ্য আর যে চরিত্রের কথা না বললেই নয়— তিনি মাস্টারমশাই। সবাই তাকে ক্ষ্যাপা বললেও তার আদর্শ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। পড়াচ্ছি ভুলে গিয়ে মাস্টারি করতেন। অর্থাৎ ছাত্ররাই চোখের সামনে বড় হয়ে উঠলে একসঙ্গে শেখাটা হয় না। মনকে বেড়ে ওঠার জায়গা দিতেই মাস্টার বলেছিলেন—

> "তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়।"[২৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এতে ওটিন-স্নো ওয়ালারা দেউলিয়া হয়ে যাবে সমাজে আলো হয়ে বসবে ছাত্ররা। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন দশ লক্ষ বছর পরের কোনো এক বিশুদ্ধ মনের যুগে, যেখানে মন একেশ্বর হয়ে উঠবে। তখন মাস্টারমশায়ের 'শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।'[২৫]

আর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে যে পড়ে রইল সে পুপে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে 'সে'-র গল্পমালা তৈরি করেছেন। পুপেও এই ছয় বছর সময়কাল ধরে বড় হচ্ছে। ন'বছরের শ্রোতার যে কোন গল্প গোগ্রাসে গিলে ফেলা, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা— এসব থাকছে না। পুপে কথককে প্রশ্ন করছে কম, সত্যযুগের অলীক গল্পে অবিশ্বাস করছে বেশি। যে পুপে একসময় তার হরণ করার গল্প শোনাচ্ছে, সেই-ই বড় হয়ে সেসব গল্প বিশ্বাস করছে না। রূপকথার জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা রাক্ষস, ব্যঙ্গমা দাদা, খরগোশের পিঠে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরি হয়ে যাওয়া, চাঁদমামা, ঘন্টাকর্ণ, তেপান্তরের মাঠ, সুকুমারের রাজপুত্র হয়ে যাওয়া, শুক-সারির গান শোনা— রূপকথার সব অনুসঙ্গই এসেছে পুপেকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পুপে কোন রূপকথার চরিত্র নয়, সে গল্পের শ্রোতা, রবীন্দ্রনাথের নাতনি— সুকুমারকে নিয়ে মাঝেমধ্যে হয়ে ওঠে হিংসুটেও। পুপের বয়স অনুযায়ী স্পষ্টতই গল্পগ্রন্থের তিনটে স্তর—

- অবাস্তব-অলীক গল্প বোনা হচ্ছে। পুপেকে হাসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পুপে এখানে শ্রোতা।
- দ্বিতীয় পর্বে পুপে চরিত্র হয়ে উঠছে। চেষ্টা করছে গল্প বানাবার। রবীন্দ্রনাথ 'সে'-কে প্রায় সরিয়ে দিয়ে পুপেকে নিয়েই গল্প তৈরি করছেন।
- তৃতীয় পর্বে সে পুরোপুরিই অনুপস্থিত। পুপে বড় হয়েছে। পুপেকে সব কথা বলা যায়। পুপে শ্রোতা ও চরিত্র উভয়ই।

ছোটদের অপরিণত মনের যুক্তি-শৃঙ্খলাকেও রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন এখানে। শিশু পুপের চিন্তা ও প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই সেই অনুযায়ী গল্পের বাঁক পরিবর্তন করেছেন। এ তৈরি রূপকথা নয়— এ এক অন্য রূপকথা, যা তৈরি হচ্ছে। গল্পে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—

> "আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে।"[২৬]

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৬
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৭
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৫
৪. সেন, সুকুমার, 'গল্পের গাঁটছড়া', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.৬০
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪৩৪
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৯৪
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২১, পৃ. ৬৭
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৩
৯. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, 'ঠাকু'মার ঝুলি', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৯
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লিপিকা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৪০
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৭
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লিপিকা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৩২
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৮
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৫
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'রবীন্দ্রনাথ: শিশু সাহিত্য', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ. ৬৫
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪৬২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 519 - 527
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৯৪
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, ‘রবীন্দ্রনাথ: শিশু সাহিত্য’, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ. ৭১
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৮৬
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪১৭
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪১৮
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪১৮
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪৩৪
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪৫৫
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪৫৮
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সে’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৪৫৭